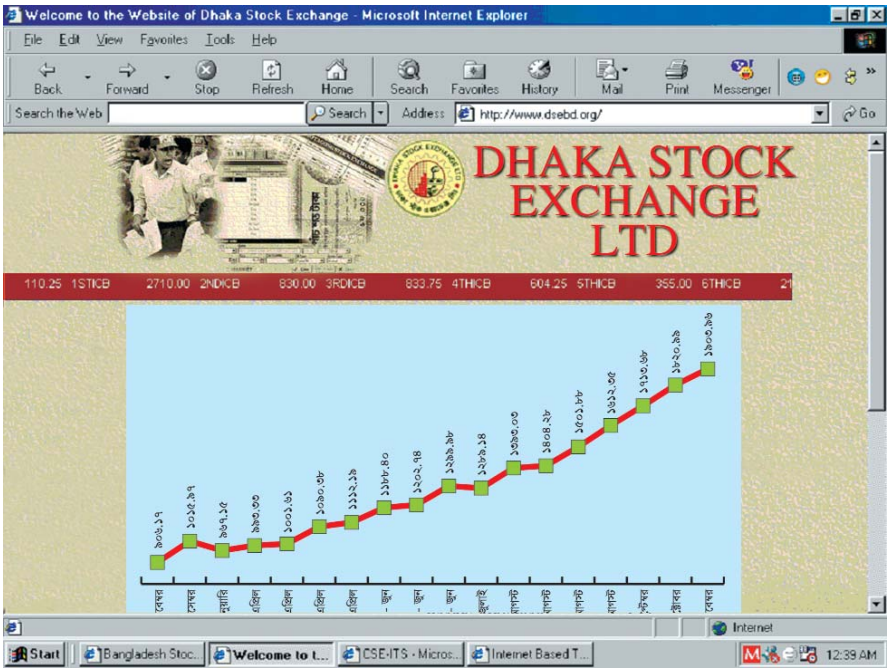

শেয়ারবাজার চাঙ্গা বিনিয়োগ এখন লাভজনক

ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী হচ্ছে শেয়ারবাজার। এতে একদিকে যেমন আশাবাদী হয়ে উঠছে বিনিয়োগকারীরা অন্যদিকে শঙ্কা-সংশয়ও কাজ করছে সবার মধ্যে... লিখেছেন **আসজাদুল কিবরিয়া** ও **ইমতিয়াজ এহসান**

শেয়ারবাজারের সুদিন বোধহয় ফিরে এসেছে। দিন যতো যাচ্ছে, বাজার যেন ততোই তেজি হয়ে উঠছে। ফলে বাজারে বিনিয়োগকারী ও ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যাও প্রতিদিন বাড়ছে। বাজারের উত্তাপ টের পাওয়া যায় ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) মূল ও এনেক্স ভবনে ঘোরাফেরা করলে। ছয় মাস আগেও যেসব ব্রোকারেজ হাউজের চেয়ারগুলো ফাঁকা পড়ে থাকত এখন তা ভিড়ে ঠাসা অবস্থা। এমনকি কম্পিউটারের স্ক্রিনে বাজারের ওঠানামা প্রত্যক্ষ করতে অনেকে টেবিলের উপরে বসছে। লিফটের সামনে লম্বা লাইন। অনেকে আবার লিফটের অপেক্ষা না করেই সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাচ্ছে আটতলা পর্যন্ত। গত কয়েক মাস ধরেই চলছে এই অবস্থা।

কিন্তু হঠাৎ করে বাজারে এমন উপচে পড়া ভিড় কেন? ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. সালাউদ্দিন আহমেদ খানের সঙ্গে এ বিষয়টা জানতেই কথা হচ্ছিল তাঁর অফিসকক্ষে। আলাপকালেই এসে হাজির হলেন বরিশাল বিএম কলেজের হিসাববিজ্ঞান বিভাগের একজন অধ্যাপক। গত সাত দিন ধরে তিনি শেয়ারবাজার পর্যবেক্ষণ করছেন। জানালেন, কয়েকটি ব্যাংকের শেয়ারে তাঁর কিছু বিনিয়োগ আছে। তবে তেজি অবস্থার খবর শুনে আরো কিছু বিনিয়োগের ইচ্ছা হয়েছে। কিন্তু ভরসা পাচ্ছেন না। কারণ, বাজার এই তেজি অবস্থায় কতদিন বজায় থাকে তা নিয়ে তার মনে রয়েছে নানা সংশয়।

এই অধ্যাপকের মতো প্রতিটি বিনিয়োগকারীর মধ্যে কম বেশি এ ধরনের আশা ও শঙ্কা একসঙ্গে কাজ করছে। নিয়মিত বিরতিতে বাজারের উর্ধ্বমুখী প্রবণতা তাদেরকে আশার আলো দেখাচ্ছে। একই সঙ্গে এই তেজিভাবই আবার শঙ্কার কারণ হচ্ছে না জানি আবার কখন বাজার পড়তে থাকে।

বিএম কলেজের ঐ অধ্যাপকের ধারণা, যে বাজার আর কখনো সেই '৯৬ হবে না।

লাভ পেতে হলে চাই সতর্কতা

- †Kv¤úvwbi Aww_K Ae¯v bv †R‡b KL‡bvB †Kv‡bv †kqv‡i wewb‡qvM Ki‡eb bv| G Rb¨ msev`cÎ, ÷K G‡·‡PÄ I †evKv‡iR nvD‡R †Kv¤úvwbi ewlK wi‡cvU, cm‡c±vm G¸‡jvi mnvqZv wbb|
- `xN‡gqv‡` fvj †kqvi a‡i ivLvi ^ah ivLb| weMZ mg‡qi `vg-`i ceYZv †`Lb|
- evRv‡ii ¸R‡e Kvb bv w`‡q wKsev evRvi wbggLx n‡j AvZswKZ bv n‡q weMZ K‡qK mßv‡ni evRvi †jb‡`b, mPK I `vg`i we‡k-lY K‡i wm×vš wbb|

ব্রোকারেজ হাউজে বিনিয়োগকারীদের ভীড়

গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ছে। হেদায়েত উল্লাহ সিকিউরিটিজের এবিএম আমিনুজ্জামান বললেন, গত তিন মাসে তার নতুন গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে প্রায় ৫০০। এই চিত্র শুধু হেদায়েত উল্লাহ সিকিউরিটিজে নয়- একাধিক ব্রোকারেজ হাউজের চিত্রই এরকম। ডিএসই'র সাবেক পরিচালক আনোয়ার হোসেন জানান, গত কয়েক মাসে তার হাউজে প্রায় ৭০০ নতুন গ্রাহক বিও অ্যাকাউন্ট খুলেছে।

ব্রোকারেজ হাউজের কাছে এসব নতুন গ্রাহকদের পরিচয় সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে জানা যায়, এদের বেশির ভাগই চাকরিজীবী। কেউ বা সরকারি প্রতিষ্ঠানে, কেউ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট বেতনে কাজ করছেন। বাজারের তেজি অবস্থা দেখে নিজের পুঞ্জিত সঞ্চয় দিয়ে একটু বাড়তি উপার্জনের আশায় শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে এসেছেন।

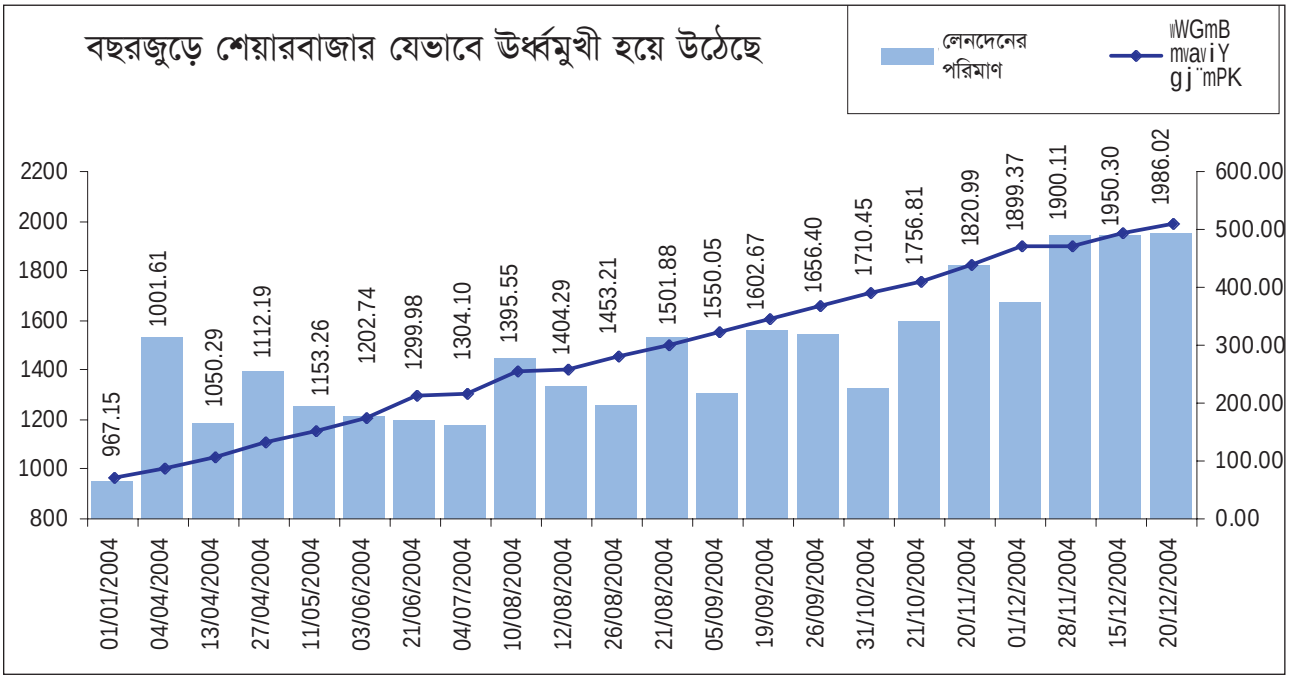

তবে তিনি এও মনে করেন, কোনো রকম যৌক্তিকতা ছাড়াই অনেক শেয়ারের দাম বাড়ছে। এজন্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের সতর্ক থাকা দরকার বলে তিনি মত দিলেন।

বিনিয়োগকারীদের মধ্যে এ ধরনের আশা-শঙ্কা কিন্তু একটা জিনিস স্পষ্ট করে তুলেছে। তা হলো, এরা এখন আগের তুলনায় অনেকটাই পরিণত ও সতর্ক। শেয়ারবাজারে হু হু করে দাম বাড়লেও আবার তা যে হু হু করে পড়তে পারে, এই বোধটা বেশির ভাগের ভেতরেই জাগ্রত রয়েছে। ফলে শেয়ার বাজার আবার আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। আকর্ষণের মূলে রয়েছে বিনিয়োগ করে একটি সন্তোষজনক লাভ পাওয়ায় প্রত্যাশা। স্টক এক্সচেঞ্জে যে তিন ক্যাটাগরিতে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর শেয়ার বেচা-কেনা হয়, সেই ক্যাটাগরিগুলোই ভালো, মাঝারি ও মন্দ শেয়ার চিনতে সহায়তা করছে।

বাড়ছে বিনিয়োগকারী

আর এসব আশা-সংশয় নিয়েই প্রতিদিনই বাজারে নতুন নতুন বিনিয়োগকারী আসছে। একাধিক ব্রোকারেজ হাউজে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, প্রতিদিনই নতুন গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ছে।

আশা-সংশয় নিয়েই প্রতিদিনই বাজারে নতুন নতুন বিনিয়োগকারী আসছে। একাধিক ব্রোকারেজ হাউজে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে, প্রতিদিনই নতুন গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ছে।

কিন্তু এরা সবাই বাজারের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নয়। বাজার-সংশ্লিষ্ট নানা লোকের পরামর্শ নিয়েই তাদেরকে লেনদেনে অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে। শেয়ারে বিনিয়োগের মাধ্যমে কিছুটা বাড়তি আয়ের আশার পাশাপাশি আবার '৯৬-এর মতো বাজার পতনে শঙ্কা নিয়ে যেন এক উদ্বেগের মধ্য দিয়ে প্রতিটি দিন পার করতে হচ্ছে এসব ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীকে।

বাজার পরিসংখ্যান কী বলে?

এক বছর আগে ২০০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) সাধারণ মূল্যসূচক ছিল ৯২৬ দশমিক ৯৮ পয়েন্ট। আর শনিবার ১৮ ডিসেম্বর ২০০৪ তারিখে ডিএসই মূল্যসূচক হয়েছে ১ হাজার ৯৭০ দশমিক ২৪ পয়েন্ট। এক বছরের ব্যবধানে দেশের প্রধান শেয়ারবাজারের মূল্যসূচক বেড়েছে ১ হাজার ৫৪ পয়েন্ট। তবে মূল্যসূচকই শুধু বাড়েনি, লেনদেনের পরিমাণও বেড়েছে ৫ গুণ। এক বছর আগে ২০০৩ সালের ১৭ ডিসেম্বর লেনদেন হয়েছিল ১০ কোটি ৭ লাখ ৬১ হাজার টাকার। ২০০৪ সালের ডিসেম্বরে তা বেড়ে হয় ৫৪ কোটি ৯৬ লাখ ৫৭ হাজার টাকা। এর মানে হলো, অনেক বেশি শেয়ার প্রতিদিন কেনাবেচা হচ্ছে, অনেক বেশি ক্রেতা-বিক্রেতা ও বিনিয়োগকারী বাজারে সক্রিয় রয়েছে। মোট হাওলার পরিমাণেও এই পরিবর্তন দেখা যায়। এক বছর আগে

যদি স্বল্প সময়ে সাময়িক লাভের আশায় শেয়ারবাজারে যান, তাহলে কোনো শেয়ারের দাম বাড়তে থাকলে 'আরো বাড়বে' এই আশায় ধরে না রাখাই ভালো। কারণ দাম যখন বাড়তে পারে, তখন কমতেও পারে। ফলে একটি সীমা রেখে টেনে বিক্রি করে ফেলুন। সব সময়ই মনে রাখা দরকার, দর যতো বাড়বে, ঐ শেয়ারে বিনিয়োগে তত সাবধানী হতে হবে

হাওলার পরিমাণ ছিল ৭ হাজার। এখন তা বেড়ে ১৯ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। আর বর্তমান সময়ে প্রায় ২৫টি'র বেশি কোম্পানির শেয়ারের দাম ১৯৯৬ সালের বাজার দরকে ছাড়িয়ে গেছে।

বন্দরনগরী চট্টগ্রামের শেয়ারবাজারেও মূল্যসূচক বেড়েছে প্রায় ২ হাজার পয়েন্ট।

স্ক্রিনে বাজারের গতি-প্রকৃতি দেখছেন বিনিয়োগকারীরা

বিনিয়োগকারীদের জন্য সাপ্তাহিক ২০০০-এর টিপস

প্রথমে আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, আপনি বিনিয়োগ করবেন না বেচাকেনা করবেন। বিনিয়োগ করার মানেই হলো দীর্ঘমেয়াদে বাজারে সম্পৃক্ত থাকা। আজ কিনে কাল বিক্রি করে বেরিয়ে এলে তা বিনিয়োগ হবে না। যদি স্বল্প সময়ে সাময়িক লাভের আশায় শেয়ারবাজারে যান, তাহলে কোনো শেয়ারের দাম বাড়তে থাকলে 'আরো বাড়বে' এই আশায় ধরে না রাখাই ভালো। কারণ দাম যখন বাড়তে পারে, তখন কমতেও পারে। ফলে একটি সীমা রেখে টেনে বিক্রি করে ফেলুন। আবার যদি শেয়ার কেনার পর দাম কমতে থাকে তাহলে কোম্পানি যদি ভালো হয় অপেক্ষা করতে পারেন। আর কোম্পানি দুর্বল হলে অল্প লোকসানে শেয়ার ছেড়ে দেয়াই মঙ্গল। সব সময় একটা কথা মনে রাখবেন, শেয়ারবাজারে ফটকাবাজি খেলা হবেই। পরামর্শ যার কাছ থেকেই নিন না কেন, খেলতে হবে আপনাকে। কোম্পানির সার্বিক অবস্থা, বাজারদরের গতি-প্রকৃতি এগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করুন। এসব তথ্য সংবাদপত্রে বা ব্রোকারেজ হাউজে পাওয়া যায়। যারা বিনিয়োগ করতে চান, তাদের ধৈর্য ধরে দামদর দেখতে হবে।

শেয়ারবাজারে বিনিয়োগ করতে হলে ঢাকা বা চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোনো একটি ব্রোকারেজ হাউজের গ্রাহক হতে হবে। সেই সঙ্গে খুলতে হবে একটি বেনিফিশিয়ারি ওনার (বিও) অ্যাকাউন্ট, যার মাধ্যমে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সিস্টেমের (সিডিএস) সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া যাবে। এজন্য ৫০০ টাকা জমা দিতে হয়। এ ক্ষেত্রে আবার ব্রোকারেজ হাউজটিকে হতে হবে ডিপি (ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট) এবং এই লাইসেন্স এসইসি সরবরাহ করে থাকে। কাজেই ব্রোকারেজ হাউজটি ডিপি কি না তা আগে জেনে না নিলে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিও অ্যাকাউন্ট না খুলেও ব্রোকারেজ হাউজের গ্রাহক হওয়া যায়। সে ক্ষেত্রে যেসব কোম্পানির কাগুজে শেয়ার লেনদেন বিলুপ্ত হয়ে পুরোপুরি ইলেকট্রনিক লেনদেন হচ্ছে (যেমন : স্কয়ার ফার্মা) সেগুলোর শেয়ার কেনাবেচা করতে পারবেন না। তাছাড়া এখন থেকে আইপিওতে প্রাথমিক শেয়ারে আবেদন করে শেয়ার বরাদ্দ পেলে বিও অ্যাকাউন্ট ছাড়া ঐ শেয়ার লেনদেন করা যাবে না। সুতরাং প্রথমেই বিও করে নেয়া ভালো। এতে সুবিধা হলো, যেসব কোম্পানির শেয়ার ডিমেট হয়ে গেছে, সেসব কোম্পানি যদি স্টক ডিভিডেন্ট দেয় তাহলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা বিও অ্যাকাউন্টে জমা হবে। প্রসঙ্গত, সিডিএস হলো কাগুজে শেয়ারের বদলে পুরোপরি ইলেক্ট্রনিক শেয়ার ব্যবস্থা, যেখানে বিনিয়োগকারীর হাতে কোনো শেয়ার থাকে না। বরং তার শেয়ারগুলো একটি নির্দিষ্ট হিসাব নম্বরের আওতায় ইলেক্ট্রনিকভাবে রক্ষিত হয়, অনেকটা ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে যেভাবে টাকা থাকে। ঐ হিসাব নম্বর ধরে শেয়ার লেনদেন করা হয়। গত বছর ডিসেম্বর মাসে স্কয়ার ফার্মার শেয়ার দিয়ে যাত্রা শুরু করে ইতিমধ্যে ৩০টি কোম্পানির শেয়ার সিডিএসের আওতায় চলে গেছে। সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (সিডিবিএল) নামে একটি কোম্পানি এ কাজ করে যাচ্ছে।

শেয়ারে বিনিয়োগ করার ক্ষেত্রে কোম্পানির আর্থিক অবস্থা জানতে হবে। এখন পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ওষুধ, আইটি ও টেক্সটাই হতে পারে তুলনামূলকভাবে লাভজনক বিনিয়োগ। মিউচ্যুয়াল ফান্ডেও বিনিয়োগ দীর্ঘমেয়াদে লাভ দেয়। তবে সব সময়ই মনে রাখা দরকার, দর যতো বাড়বে, ঐ শেয়ারে বিনিয়োগে তত সাবধানী হতে হবে। যেমন প্রাইম ব্যাংকের শেয়ারের অভিহিত মূল্য ১০০ টাকা। বাজারে এটি এখন ৭০০ টাকার বেশি দরে লেনদেন হচ্ছে। বোঝা প্রয়োজন যে কেন এতো দাম? সামনে বার্ষিক সাধারণ সভা ও সেই সভায় ভালো লভ্যাংশ দেয়া হবে কি না, ব্যাংকটি বছরান্তে ভালো মুনাফার মুখ দেখবে কি না এগুলো বিচার করে ইতিবাচক জবাব মিললে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। এজন্য কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদন ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

এক বছর আগে ১৭ ডিসেম্বর সিএসই'র মূল্যসূচক ছিল ১ হাজার ৬২০ দশমিক ৪৪ পয়েন্ট। ২০০৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর তা বেড়ে দাঁড়ায় ৩ হাজার ৫৮৯ পয়েন্ট। লেনদেনেও প্রায় তিন গুণ পরিবর্তন আসে। এক বছর আগে লেনদেন ছিল ৪ কোটি ৮১ লাখ ৮৪ হাজার। এখন তা ১৩ কোটি ছাড়িয়ে গেছে।

তবে সমস্যা হলো লেনদেনের এত বড় পরিবর্তনের বেশির ভাগই এখনও অল্প কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উভয় স্টক এক্সচেঞ্জেই মোট লেনদেনের মধ্যে শীর্ষ ১০টি কোম্পানির লেনদেনই বাজারের ৬০ শতাংশই নিয়ন্ত্রণ করছে। এত অল্প সংখ্যক শেয়ারে এত বেশি লেনদেন হওয়ায় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকি বাড়ছে বলে মত দেন বাজার-সংশ্লিষ্ট অনেকে।

এ প্রসঙ্গে ডিএসই প্রেসিডেন্ট আহমেদ ইকবাল হাসান বলেন, 'বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীর আস্থা আবার ফিরে এসেছে সেটি আশার কথা । কিন্তু চাহিদার সঙ্গে সমন্বয় করার মতো ভালো শেয়ার বাজারে আসছে না। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে অল্প সংখ্যক শেয়ারের বেশি বিনিয়োগ হচ্ছে। তবে খারাপ শেয়ারের দিকে বিনিয়োগ যাচ্ছে না সেটি শুভ লক্ষণ।' ডিএসই প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, 'বাজারের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় ভারসাম্য আনার জন্য মোবাইল

এনসিসি ব্রোকারেজ হাউজের একাংশ

'সামগ্রিক পরিস্থিতিই বলে নতুন করে আর কোনো '৯৬ হবে না'

ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, শেয়ারবাজার

সাপ্তাহিক ২০০০ : গত কয়েক মাস ধরে শেয়ারবাজারে তেজি অবস্থা আছে। এর পেছনে কোন বিষয়টি কাজ করছে বলে আপনি মনে করেন?

ড. মির্জা আজিজুল ইসলাম : কোনো একটা বিশেষ কারণে নয়, অনেকগুলো ঘটনার সমন্বয়ে শেয়ারবাজারে ভালো অবস্থা বিরাজ করছে। ব্যাংকের সুদের হার বিগত এক বছরে কমানো হয়েছে, আগামীতে আরো কিছুটা কমানোর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তৎপর। সঞ্চয়পত্রের সুদের হারও বিগত বাজেটে কিছুটা কমানো হয়েছে। এ বছর দু'টি কোম্পানির শেয়ারবাজার এলেও সেগুলোর ক্ষেত্রে ঘোষিত প্রাথমিক শেয়ারের তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। স্বভাবতই অনেকে প্রাথমিক শেয়ার পাননি। ফলে নগদ টাকা যা ফেরত গেছে সেগুলোর কিছুটা শেয়ারবাজারে এসেছে। তাছাড়া ডিসেম্বর মাসের আগে অনেক ভালো কোম্পানি লভ্যাংশ ঘোষণা করে। এসব উপাদানই এই মুহূর্তে শেয়ারবাজারের উর্ধ্বগতির কারণ।

২০০০ : বাজার চাঙ্গা হলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা আতঙ্কে ভোগেন- আবার '৯৬-এর মতো বিপর্যয় হবে না তো?

আজিজুল : '৯৬-এর অভিজ্ঞতা অনেকের মধ্যেই শেয়ারবাজার সম্পর্কে একটি ভীতি তৈরি করেছে। তবে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অবগতির জন্য এটুকু বলা যেতে পারে যে, সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিগত এক বছরে বেশ উন্নতি হয়েছে। এসইসির যে বিভিন্ন আইন ও প্রবিধি রয়েছে, তার প্রয়োগ জোরদার হয়েছে। দ্বিতীয়ত, স্টক এক্সচেঞ্জগুলোতে একটা পরিবর্তন এসেছে। ব্যবস্থাপনাকে মালিকানার সঙ্গে কিছুটা পার্থক্য করা হয়েছে। তাছাড়া এসইসির বাজারটাকে পর্যবেক্ষণ কারার একটা ন্যূনতম যোগ্যতা এখন হয়েছে। ফলে যেকোনো ধরনের কারসাজি ধরা পড়লেই এসইসি সেখানে হস্তক্ষেপ করছে। তাই সামগ্রিক পরিস্থিতিই বলে, নতুন করে আর কোনো '৯৬ হবে না।

২০০০ : '৯৬-এর শেয়ার কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে এসইসির দায়ের করা মামলাগুলো ৭ বছরেও বিচারের মুখ দেখেনি। সে ব্যাপারে এসইসি কি পদক্ষেপ নেবে?

আজিজুল : একেবারে কিছু অগ্রগতি হয়নি তা নয়। কিছু মামলা উচ্চ আদালতে যাওয়ার পর তা আবার নিম্ন আদালতে ফেরত পাঠানো হয়েছে বিচারের জন্য। অনেকগুলো মামলায় তার প্রাথমিক অবস্থাও কাটিয়েছে। তবু এটা ঠিক যে, এখন পর্যন্ত যেহেতু কোনো মামলার চূড়ান্ত রায় হয়নি, সেহেতু বিনিয়োগকারীদের ওপর তার একটা নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এ ব্যাপারে আমরা চেষ্টা করছি, তবে পুরো আইনি ব্যবস্থাটা তো আমাদের হাতে নেই।

২০০০ : উৎপাদন কর্মকান্ড বন্ধ এরকম কিছু কোম্পানি বিলোপর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে- সম্পর্কে এসইসির বক্তব্য কি?

আজিজুল : অনেকগুলো কোম্পানি দীর্ঘদিন বার্ষিক সাধারণ সভা করে না। অনেকের আবার উৎপাদন কর্মকান্ডও দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ আছে। যেসব কোম্পানি এজিএম করে না তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এসইসি এ পদক্ষেপ নিয়েছে। আর যাদের উৎপাদন কর্মকান্ড দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ তাদের অনেক সম্পদ আছে। কোম্পানি লিকুইডাইজেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ সাধারণ বিনিয়োগকারীর মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে ও রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক অব কোম্পানিজকে অনুরোধ করা হয়েছে।

২০০০ : বাংলাদেশে অডিটের মান নিয়ে বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ রয়েছে। অডিটের মান আরো বিশ্বাসযোগ্য করার ব্যাপারে এসইসি কি ভাবছে?

আজিজুল : এসইসি সম্প্রতি ৬টি কোম্পানির অডিট মূল্যায়ন করে এর মধ্যে নানা অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে। এসব অডিটের বিরুদ্ধে

ফোন কোম্পানি, বিদ্যুৎ খাতের কোম্পানিগুলোর শেয়ারবাজার আনার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোম্পানি ও কর্তৃপক্ষকে বারবার লিখছি।' তাদের মনোভাব ইতিবাচক হলে বাজারের গভীরতা আরো বাড়বে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

তবে বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের (এসইসি) সার্ভিলেন্স বিভাগের নির্বাহী পরিচালক আনোয়ারুল কবীর ভূঁইয়া বলেন, 'বাজার পরিস্থিতির ওপর নিয়ন্ত্রক সংস্থার তীক্ষ্ণ নজরদারি আছে। কেউ নিয়ম বহির্ভূত কোনো কাজ করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিগত কয়েক মাসে এ ধরনের কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।' তবে তিনি এও বলেন যে, এসইসি কোনো পদক্ষেপ নিলে তা নিয়ে অনেকে উল্টো এসইসিকে দোষ দিয়ে বলে যে, এতে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, আসলে এসইসির পদক্ষেপে হয়তো বাজার থমকে দাঁড়ায় বা সাময়িক দর পতন ঘটে। এতে স্বাভাবিকভাবেই কিছু বিনিয়োগকারী প্রত্যাশিত লাভের মুখ দেখতে পায় না। ফলে তারা এসইসিকে ভুল বোঝে। অথচ বড় ধরনের কোনো ক্ষতি যেন না হয় সেজন্যই এসইসি এসব পদক্ষেপ নিয়েছে বলে তিনি মত দেন। আইসি যে বাজারে নজর রাখছে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। জেড গ্রুপের অনেক শেয়ারের লেনদেন বেশি দামে বেচা-কেনা হচ্ছিল। এসইসি মৌখিকভাবে কয়েকটি ব্রোকারেজ হাউজকে রোববার সতর্ক করার পরপরই এই গ্রুপের শেয়ার লেনদেন নিম্নমুখী হয়ে পড়ে মানে বাজার সংশোধন হয়।

ডিএসইর সাবেক পরিচালক আনোয়ার হোসেন মনে করেন, হিসাব-নিকাশ করেই বিনিয়োগ করা উচিত। কোম্পানির চলতি লেনদেন, অতীত রেকর্ড এবং বাজার পরিস্থিতি এসব বিবেচনা বিনিয়োগকারীর মনে রাখা দরকার। তিনি আরো বলেন, 'কিন্তু দেখা যাচ্ছে, মৌলিকের সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই এমন অনেক ক্ষেত্রেও বিনিয়োগ হচ্ছে। বাংলাদেশের বাজারের যে গভীরতা তাতে দাম আয় অনুপাত 'দুই অঙ্ক' হলেই বিনিয়োগকারীর সতর্ক হওয়া উচিত।'

ডিএসই ভবন

বাংলাদেশের বাজারের যে গভীরতা তাতে দাম আয় অনুপাত 'দুই অঙ্কের' হলেই বিনিয়োগকারীর সতর্ক হওয়া উচিত।

হিসাব-নিকাশ করেই বিনিয়োগ করা উচিত। কোম্পানির চলতি লেনদেন, অতীত রেকর্ড এবং বাজার পরিস্থিতি এসব বিবেচনা বিনিয়োগকারীর মনে রাখা দরকার

বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিজনেস ইনফরমেশন এডভাইজারি সার্ভিসেসের (বিআইএএসএল) তথ্য থেকেও দেখা গেছে বর্তমানে ব্যাংকিং খাতের শেয়ারগুলোতেই দাম আয় অনুপাত সবচেয়ে বেশি। বিআইএএসএলের তথ্য অনুসারে বর্তমানে ব্যাংক খাতে দাম আয় অনুপাত ২০ দশমিক ৬৭, প্রকৌশলী খাতে ১৯ দশমিক ৬৮, ইন্স্যুরেন্সে ১৮ দশমিক ১১, ফার্মা ও রসায়নে ১৮ দশমিক ৯৩, খাদ্য ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ১০ দশমিক ৫৬, ইনভেস্টমেন্ট খাতে ৮ দশমিক ১২ এবং বস্ত্র খাতে ১৩ দশমিক ১৪।

এ সম্পর্কে ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিয়াউল হক খন্দকার বলেন, ব্যাংকিং খাতে এখন বিনিয়োগ বেশি হচ্ছে। কিন্তু আয়-দাম অনুপাত তুলনা করলেই বোঝা যাবে বাজারের বিনিয়োগের আরো বিকল্প জায়গা আছে। তবে শেয়ার কেনার ক্ষেত্রে শুধু আয়-দাম অনুপাতই নয়, তাৎক্ষণিক মুনাফা বা অন্যান্য আরো শর্ত কাজ করে।

বাজার তেজী কেন?

শেয়ারবাজার কেন তেজি এর এক কথায় জবাব দেয়া সম্ভব নয়। তবে, সরকার গৃহীত কিছু কিছু আর্থিক ও রাজস্ব পদক্ষেপ ইতিমধ্যে প্রভাব ফেলতে আরম্ভ করেছে বলে ধারণা করা যায়। এর মধ্যে অন্যতম হলো ব্যাংকের ও সঞ্চয়পত্রে সুদের হার কমিয়ে দেয়া। এখন ব্যাংকে স্থায়ী আমানত হিসেবে

পদক্ষেপ নিতে ইতিমধ্যেই আইক্যাবকে অনুরোধ করা হয়েছে। আর কোম্পানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি এসইসির বিবেচনায় আছে। তবে হিসাব পুনঃ নিরীক্ষণের একটা অসুবিধা হলো, আমাদের নিয়োগকৃত অডিটরকেও পারিতোষিক দেয়া নিয়ে কোনো কোনো সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়। তবে কোম্পানি অডিটরদের টাকা দেয় না। অডিটের মান আরো উন্নত ও বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য একটি পেশাগত দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠান থাকা উচিত যেখানে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টরা তাদের পেশার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।

২০০০ : শেয়ারবাজারের চাঙ্গা অবস্থা ধরে রাখতে আর কি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে?

আজিজুল : সামগ্রিকভাবে মোট দেশজ প্রবৃদ্ধিতে (জিডিপি) একটা স্থিতিশীল ধারা বজায় আছে। দেশী-বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ছে এবং আরো অনেক বিদেশী বিনিয়োগের আগ্রহের কথা জানা যাচ্ছে। তবে এখনো বিনিয়োগের বড় অর্থের যোগান আসছে ব্যাংকিং খাত থেকে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মূলধন বাজার থেকে সংগ্রহের মাধ্যমেই শিল্পায়ন হয়েছে। বিদেশী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশের বিদ্যুৎ, মোবাইল ও স্থায়ী ফোনে বিনিয়োগ আরো বাড়াতে চায়। এসব উদ্যোক্তা চাইলে মূলধন বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। তবে শেয়ারবাজারে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে কোম্পানি ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠা জরুরি।

শেয়ার মামলা কবে নিষ্পত্তি হবে?

আট বছর আগে দেশের শেয়ারবাজারে ঘটে যাওয়া বহুল আলোচিত কেলেঙ্কারি নিয়ে দায়েরকৃত মামলাগুলোর কোনো অগ্রগতি নেই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. আমিরুল ইসলাম চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এসইসি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ১৯৯৭ সালে ফৌজদারি মামলা দায়ের করে। কিন্তু দীর্ঘ ৭ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও এখন পর্যন্ত কোনো মামলার রায় হয়নি। ক্ষতিগ্রস্তদের অনেকেরই অভিযোগ, এসইসির ঢিমেতালের কারণেই মামলাগুলোর কোনো অগ্রগতি নেই।

এসইসি সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্তদের আবেদনের প্রেক্ষিতে ১৫টি মামলার মধ্যে বর্তমানে ২টি মামলা আপিল বিভাগে, ৬টি মামলা হাইকোর্ট বিভাগে ও বাকি ৭টি মামলা মহানগর দায়রা আদালতে শুনানির জন্য আছে।

ক্ষতিগ্রস্ত একজন বিনিয়োগকারী হুমায়ুন কবির জানান, '৯৬-এর নায়করা সাজা না পাওয়ায় শেয়ারবাজারের প্রতি মানুষের আস্থার সংকট এখনো কাটেনি। তিনি অভিযোগ করে বলেন, যে শাইনপুকুর হোল্ডিংয়ের শেয়ার কিনে শত শত মানুষ ফতুর হয়েছে, সেই কোম্পানির শেয়ার এখনো হাজার হাজার লেনদেন হয়, দামও বৃদ্ধি পায়।

তবে শুধু '৯৬-এর শেয়ার কেলেঙ্কারির মামলা নয়, প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত এসইসি দায়েরকৃত ৯৪টি মামলার কোনোটিরই রায় হয়নি। বাজার-সংশ্লিষ্টদের অভিযোগ, এসইসির নিষ্ক্রিয়তার কারণেই দীর্ঘদিন ধরে এসব মামলা ঝুলে আছে।

এ সম্পর্কে এসইসি চেয়ারম্যান মির্জা আজিজুল ইসলাম প্রথম আলোকে বলেন, দেশের প্রচলিত আইনেই মামলাগুলো পরিচালিত হচ্ছে। এসইসির নিজস্ব আইনজীবী নিয়োগের ক্ষমতা থাকলেও তাদের ফি দেওয়ার ক্ষমতা নেই। ফলে সরকার কর্তৃক মনোনীত আইনজীবীদের মধ্যেই মামল গুলো পরিচালিত হচ্ছে বলে তিনি জানান। এসইসির চেয়ারম্যান বলেন, '৯৬-এর শেয়ার কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাগুলোর ক্ষেত্রে সম্প্রতি বেশ কিছু অগ্রগতি হয়েছে। অচিরেই নিম্ন আদালতে কয়েকটি মামলার শুনানি শুরু হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

তবে আইন প্রক্রিয়ার জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রতা এবং আইনজীবী নিয়োগে সরকারের ওপর নির্ভরতা সংক্রান্ত এসইসির এসব বক্তব্যে সন্তুষ্ট হতে পারেনি বাজার সংশ্লিষ্ট অনেকে। তাদের অভিযোগ, অপরাধ করে শাস্তি না পাওয়ার কারণে এ চক্রটি এখনো

টাকা জমা রাখলে সর্বোচ্চ ১০%-এর বেশি সুদ মিলবে না। সঞ্চয়পত্র কিনলে সর্বোচ্চ সুদ ১০.৫%। এই অবস্থায় শেয়ারে বিনিয়োগ করলে ১০% লভ্যাংশ পাওয়াটা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। তাছাড়া, নিয়মিত বিকিকিনি করতে পারলে রয়েছে নগদ লাভের সম্ভাবনা। এসব আর্থিক বিবেচনা করে অনেকেই শেয়ারবাজারে আসতে উৎসাহবোধ করছে।

এদিকে ট্রেজারি বন্ড শেয়ারবাজারে আনারও উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এসব বন্ড মেয়াদান্তে সুদ সর্বোচ্চ ৮.৫% হলেও পুরোপুরি নিরাপদ বিনিয়োগ। টাকা খোয়া যাওয়ার কোনোই সম্ভাবনা নেই। ফলে, তুলনামূলকভাবে লাভ একটু কম হলেও দীর্ঘমেয়াদে একটি ভালো সুযোগ হিসেবেই এটি বিবেচিত হতে পারে।

আবার কালো টাকা সাদা করার যে সুযোগ রয়েছে, সে কারণেও বেশ কিছু অর্থ বাজারে এসেছে। শেয়ারে বিনিয়োগ করা হলে উৎস জানতে চাওয়া হবে না এই সুযোগ দেয়ায় বেশ কিছু কালো টাকা বাজারে এসেছে বলে জানা গেছে।

বাজারে কিছু বিদেশী বিনিয়োগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় কয়েক লাখ ডলারের মতো বিদেশী বিনিয়োগ এই মুহূর্তে বাজারে আছে।

তাছাড়া প্রিমিয়ার ব্যাংকের প্রাথমিক শেয়ারসহ কয়েকটি বীমা †Kv¤úvwbi প্রাথমিক শেয়ার সামনে বাজারে আসবে। ফলে এখানেও বিনিয়োগ করার সুযোগ আছে।

প্রাথমিক শেয়ার নেই

তবে আয়-দাম অনুপাতের বিচার

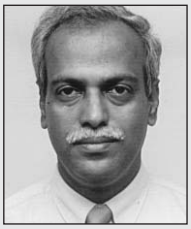

'ভাল কোম্পানির শেয়ার সরাসরি তালিকাভুক্ত হতে পারে'

সালাউদ্দিন আহমেদ খান

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ

সাপ্তাহিক ২০০০ : শেয়ারবাজারের বর্তমান তেজি অবস্থা নিয়ে মানুষের উৎসাহ ও উদ্বেগ দুটোই দেখা যাচ্ছে?

সালাউদ্দিন আহমেদ খান : বাজারে পুঁজির সরবরাহ বেড়েছে বলেই বাজার ঊর্ধ্বমুখী। এই পুঁজির কিছুটা আসছে মানুষের সঞ্চয় থেকে। আবার কেউ কর অব্যাহতি পেতে চায় বা উৎসহীন আয়কে বৈধ করতে চায়। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বিগত কয়েক মাসে পুঁজির সরবরাহ অনেক। গত ১১ থেকে ১৫ ডিসেম্বর প্রতিদিন গড়ে লেনদেন ছিল ৪৬ কোটি ১০ লাখ। দীর্ঘদিন পর লেনদেনে এ ধরনের তেজি অবস্থায় স্বভাবতই সংশ্লিষ্ট সবাই কিছুটা চাপ অনুভব করেছে। তবে স্টক এক্সচেঞ্জের সার্ভিলেন্স বিভাগ সর্বদা বাজারের ওপর তীক্ষ্ণ নজরদারি রেখেছে। ফলে বাজারে বড় ধরনের কোনো অঘটনের সম্ভাবনা নেই।

২০০০ : বাজারে ভালো শেয়ারের সংকট আছে। শেয়ার আনার ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে?

সালাউদ্দিন : প্রাথমিক শেয়ারবাজারে আনার প্রক্রিয়াটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে একটি বিকল্প পথও খোলা আছে। ভালো কোম্পানি যেমন- মোবাইল ফোন কোম্পানি যদি বাজারে আসতে চায়, তাহলে প্রাথমিক শেয়ার ছাড়ার সব প্রক্রিয়ার বাইরে তারা বাজারে তালিকাভুক্ত হতে পারে। এর আগে স্কয়ার টেক্সটাইল সরাসরি তালিকাভুক্তির মাধ্যমে বাজারে এসেছে। তবে বিনিয়োগকারীদের বাজারে ধরে রাখতে সরকারের হাতে যে বিভিন্ন লাভজনক কোম্পানির ৭৬ লাখ শেয়ার আছে, সেগুলোকে জরুরি ভিত্তিতে বাজারে আনা যেতে পারে।

২০০০ : সম্প্রতি ডিএসই বেশকিছু কোম্পানিকে তালিকাচ্যুত করেছে, এতে করে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না কি?

সালাউদ্দিন : '৯৬-এর পতনের পর বিগত কয়েক বছরে উৎসাহ নিয়ে নতুন অনেক বিনিয়োগকারী শেয়ারবাজারে এসেছে। এগুলোর অনেকগুলো বর্তমানে জেড গ্রুপে। আবার অনেকে পুঁজিবাজার থেকে টাকা নিয়ে আর উৎপাদন কর্মকান্ডে যায়নি। এখন বাজারের অবস্থা চাঙ্গা। এ অবস্থায় সাধারণ বিনিয়োগকারীদের হাতে যাতে খারাপ শেয়ার না যায় সেজন্যই নিম্নমানের রুগ্‌ণ কোম্পানিকে তালিকাচ্যুত করা হয়েছে।

শেয়ারবাজারে প্রভাব বিস্তার করে আছে। মাঝে মাঝে তারা কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে বাজারে শেয়ারের দাম বাড়ায়। আর সেই ফাঁদে পা দেয় ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারীরা। অথচ এসব অপরাধী আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকছে।

'৯৬-এর কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত যাদের বিরুদ্ধে মামলা

ফার্স্ট ক্যাপিটাল সিকিউরিটিজ লিমিটেডের রেজওয়ান বিন ফারুক, দোহা সিকিউরিটিজ লিমিটেডের এ কে এম সামসুদ্দোহা, এসইএস কোম্পানি লিমিটেডের রুনা আলম, সাবেদ সিদ্দিকী, রূপন ওয়েল অ্যান্ড ফিডস লিমিটেডের মোঃ নুরন্নবী, এইচএমএস ফাইন্যান্সিয়াল কনসালট্যান্সি অ্যান্ড সিকিউরিটিজ লিমিটেডের হেমায়েত উদ্দিন আহমেদ, মুশতাক আহমেদ সাদেক, সৈয়দ মাহবুব মোরশেদ, শরীফ আতাউর রহমান, আহমেদ ইকবাল হাসান, সিকিউরিটিজ কনসালট্যান্স লিমিটেডের এমজি আজম চৌধুরী, শহিদুল্লাহ, অধ্যাপক মাহবুব আহাম্মেদ, ইমতিয়াজ হোসেন অ্যান্ড কোম্পানির ইমতিয়াজ হোসেন, চিক টেক্স লিমিটেডের ইঞ্জিনিয়ার মোঃ মাকসুদুর রহমান, ইফতিয়ার মোহাম্মদ, প্রিমিয়াম সিকিউরিটিজ লিমিটেডের এ রউফ চৌধুরী, মশিউর রহমান, সৈয়দ এইচ চৌধুরী, অনু জায়গীরদার, আমাম সি ফুডস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের জহুর আহমেদ, অলিম্পিক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের আজিজ মোহাম্মদ ভাই, এপেক্স ফুডস লিমিটেডের জাফর আহমেদ, জহুর আহমেদ, শাইনপুকুর হোল্ডিংস লিমিটেডের সালমান এফ রহমান, এ বি সিদ্দিকুর রহমান, বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের সালমান এফ রহমান, এ এস এফ রহমান, ডি এইচ খান, চিটাগাং সিমেন্ট ক্লিংকার গ্রাইন্ডিং কোম্পানি লিমিটেডের এ এম এম শহিদুল হক বুলবুল, মোঃ রকিবুর রহমান ও আবু তায়েব।

অভিযুক্ত এসব ব্যক্তি মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে আদালতের বিভিন্ন আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চ আদালতের আশ্রয় নেয়ার ফলে মামলার বিচারকাজ দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

তবে এর আগে ২০০৩ সালে অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের সঙ্গে এসইসির বৈঠকে শেয়ার সংক্রান্ত মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য হাইকোর্টে একটি বিশেষ বেঞ্চ গঠন করার সুপারিশ রাখা হয়।

এ ব্যাপারে আইন মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলে জানানো হয়, দেশে শেয়ার সংক্রান্ত মামলাগুলো নিয়ে আলাদা কোনো বেঞ্চ গঠনের চিন্তা-ভাবনা এই মুহূর্তে সরকারের কাছে নেই। তাছাড়া শেয়ার সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা এতো সীমিত যে, হাইকোর্টে আলাদা বেঞ্চ করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। শেয়ার সংক্রান্ত মামলাগুলো অর্থঋণ আদালতে স্থানান্তর করার সম্ভাবনা আছে কি না সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে জানানো হয়, এর কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারণ সেখানেও এখন অনেক মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

বিশ্লেষণের চেয়ে বাজার-সংশ্লিষ্ট অনেককেই বেশি গুরুত্ব দিতে চান নতুন প্রাথমিক শেয়ার (আইপিও) বাজারে আসার ওপর। তাদের মত ২০০৩ সালে ১৪ কোম্পানির প্রায় ১১৪ কোটি টাকার পুঁজি সংগ্রহের বিপরীতে আবেদন পড়েছিল আড়াই হাজার কোটি টাকার উর্ধ্বে। ২০০৪ সালে শুধু এক্সিম ব্যাংকের ৩১ কোটি ৩৮ লাখ টাকার বিপরীতে ৫০০ কোটি টাকার উপরে আবেদন পড়েছিল।

এর মানেই হলো, প্রাথমিক বাজারের খাটানোর জন্য তহবিলের কোনো ঘাটতি নেই। ফলে উদ্যোক্তারা এখন খুব সহজেই বাজার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করতে পারবে। সমস্যা হলো এসইসির কাছ থেকে আইপিওর আবেদন পেতে গেলে বেশ কিছু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। অতীতের কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এসইসি এখন খুব সতর্কভাবে কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই অনুমোদন দেয়। এসইসির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'অনেক কোম্পানিই আবেদনের সময় প্রয়োজনীয় কিছু কাগজপত্র ঠিকমতো দাখিল করে না। ফলে, আমরা তাদের অনুমতি দেই না। নতুন করে কাগজপত্র জমা দিয়ে পুনঃআবেদন করতেও সময় লেগে যায়।'

তবে অনেকেই নতুন আইপিও আনতে গিয়ে গুণগত মানসম্পন্ন কোম্পানিকে বাজারে আনার বিষয়টির ওপর জোর দিয়েছেন। তাদের মতে, এসইসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৩৮টি কোম্পানি প্রাথমিক শেয়ার ছেড়ে ডিএসইতে তালিকাভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৭২টি কোম্পানির শেয়ারই এখন 'জেড' গ্রুপভুক্ত মানে দুবল ও বাজে শেয়ার। 'জেড' গ্রুপভুক্ত এসব নিম্নমানের কোম্পানি এজিএম করে না, লভ্যাংশ দেয় না এমনকি অনেকগুলো কোম্পনির ব্যবসায়িক কোনো অস্তিত্বও নেই।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এসইসির একজন পরিচালক বলেন, 'এসইসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রায় দেড় শতাধিক কোম্পানি বাজারে এসেছে। অনেক কোম্পানি বাজারে আসার সময় শুধু বিল্ডিং ও সাইনবোর্ড দেখিয়ে আইপিও ছেড়েছে। পরে বাজার থেকে টাকা নিয়ে আর উৎপাদন কর্মকাণ্ডে যায়নি। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যাদের এখন আর সাইনবোর্ডও খুঁজে পাওয়া যায় না।'

এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য এসইসি এখন এ ধরনের কিছু কোম্পানি বিলোপের উদ্যোগ নিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসব নিম্নমানের কোম্পানি এসইসির অনুমোদন নিয়ে বাজারে এলো কিভাবে? এসইসির তরফ থেকে এর কোনো সদুত্তর মেলেনি। তবে, এসইসির অদক্ষতা ও দুর্নীতি যে সাধারণ বিনিয়োগকারীদেরকে কত বড় বিপদে ফেলতে পারে এই ঘটনাই তার প্রমাণ।

এসইসি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৯৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত মোট ১৩৮টি কোম্পানি প্রাথমিক শেয়ার ছেড়ে ডিএসইতে তালিকাভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে ৭২টি কোম্পানির শেয়ারই এখন 'জেড' গ্রুপভুক্ত মানে দুবল ও বাজে শেয়ার। 'জেড' গ্রুপভুক্ত এসব নিম্নমানের কোম্পানি এজিএম করে না, লভ্যাংশ দেয় না এমনকি অনেকগুলো কোম্পনির ব্যবসায়িক কোনো অস্তিত্বও নেই

সামনে কী?

শেয়ারবাজার সামনে কী হবে তা আগাম বলা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। তবে, বর্তমান প্রবণতা থেকে এটা ধারণা করা যায় যে বাজারের গতিশীলতা বজায় থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে যারা শেয়ার কেনাবেচা করবেন, তাদের যেমন একটু সতর্ক হতে হবে তেমনি সতর্ক নজরদারি রাখতে হবে এসইসির। বাজারে জুয়াবাজি ও ফটকা খেলা থাকবে, থাকবে কারসাজির প্রচেষ্টা। কারণ, এগুলো শেয়ারবাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ছবি : **খালেদ সরকার**